ইউনিট ৮: শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক প্রবণতা ও সমস্যাসমুহ

Trends and Issues in Educational Administration and Management

ভূমিকা

প্রশাসন শব্দটি প্রাচীন। ব্যবস্থাপনা সেক্ষেত্রে বেশ নতুন। ব্যবস্থাপনা ধারণার উদ্ভব হয়েছে শিল্প বিপ্লবের পরে। অন্যদিকে প্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্র, গির্জা ও সেনাবাহিনী পরিচালনার কার্যাবলিকে প্রশাসন বলে অভিহিত করা হতো। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত নীতিসমূহ প্রণয়ন করা প্রশাসনের কাজ এবং সে নীতিগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনা ও তদারকি করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনার। শিক্ষা প্রশাসনের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক বা সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা। কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যাবতীয় কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করা, নীতি নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশাসন বলা হয়। প্রশাসন সুচিন্তিত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মী নিয়োগ ও নির্দেশনা, প্রতিষ্ঠানের মানবিক ও বস্তুগত সম্পদ ও উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কাজের সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের বৃহৎ শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি। বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যত শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে তার মোট সংখ্যা বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এত বড় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায়, অর্থায়নে, ব্যবস্থাপনায় এবং বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা থাকাই স্বাভাবিক।

বর্তমান ইউনিটে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক কিছু প্রবণতা ও সমস্যা যেমন গুণগত শিক্ষা, গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, পরিমাপক, টিকিউএম, বিদ্যালয়ের হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যযাচাই, দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এই ইউনিটের পাঠ্যসমূহঃ

পাঠ ৮.১	:	গুণগত শিক্ষা, বাংলাদেশের শিক্ষায় গুণগতমান ও সমতা
পাঠ ৮.২	:	প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন এবং সোয়াট (SWOT) বিশ্লেষণ: মূল্যযাচাই
পাঠ- ৮.৩	:	গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, পরিমাপক ও নিশ্চিন্তকরণের উপাদান
পাঠ ৮.৪	:	শিক্ষায় সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনা (টি কিউ এম), উদারিকরণ, প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবাল্াইজেশন
পাঠ- ৮.৫	:	শিক্ষার প্রভাব ও প্রতিফলন: জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি
পাঠ- ৮.৬	:	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: পদ্ধতি, সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ- ৮.৭	:	ই-গভার্মেন্ট: ধারনা, বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন ও সমস্যা, শিক্ষায় ই-গভর্নেন্স

পাঠ- ৮.১: গুণগত শিক্ষা, বাংলাদেশে শিক্ষায় গুণগতমান ও সমতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গুণগত শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার অপরিহার্য উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার পথে বাধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার অর্জনের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গুণগত শিক্ষার ধারণা

গুণগত শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষা বর্তমানে শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রটি উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের শিক্ষাবিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোটেক্সই উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গুণগত শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়কে জাতিসংঘ শিক্ষা দশক হিসেবে গণ্য করে ইউনেস্কো গুণগত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপাদান এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। এই সংস্থাটি গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নেশিক্ষারপূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য করে বলেছে- "Quality education is a prerequisite for education for sustainable development". বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনজুর আহমদ গুণগত বা মানসম্মত শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন, "এটি এমন এক কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা যা পরবর্তী শিক্ষাস্তরে অধ্যয়নে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলে"।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ বেরি (Bayre) গুণগত শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন– "Quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of the customers of the process and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process on the outputs from the process of educating". (Bayre and et.al: 2000).

ইউনেস্কো গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নে শিক্ষারপূর্ব শর্ত হিসেবে মনে করে। এ সংস্থাটির মতে গুণগত শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে–

ক. মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ও মান উন্নয়ন (Promotion and Improvement of Basic Education);
খ. টেক্সই উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে বিরাজমান শিক্ষা কার্যক্রমে নব দিগন্তেরর সূচনা করা (Re-orienting existing education programs at all levels to address sustainable development);
গ. প্রশিক্ষণ প্রদান (Providing Training);
ঘ. উচ্চশিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ (Involving Higher Education)।

গুণগত শিক্ষা বুঝাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন যা দেলর কমিশন (Delor Commission) নামে পরিচিত সেখানে সকলের জন্য শিক্ষার চার স্তম্ভের ভিত্তিতে সকল ধরনের মানব অধিকার সমর্থন করে। শিক্ষার চারটি স্তম্ভ

হচ্ছে– (১) জানতে শেখা (Learning to know); (২) করতে শেখা (Learning to do); (৩) মিলেমিশে বসবাস করতে শেখা (Learning to live together) এবং (৪) বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা (Learning to be)।

গুণগত শিক্ষার জন্য অপরিহার্য উপাদান

- আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম;
- মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক
- পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষাদান সামগ্রী ও ভৌত অবকাঠামো;
- যথার্থ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি;
- কার্যকর ব্যবস্থাপনা ওতত্ত্বাবধান;
- উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি;
- গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ;
- ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ;
- মানসম্মত পাঠাগার;
- মানসম্মত বিজ্ঞানাগার;
- শিক্ষণ-শিখনের জন্য পর্যাপ্ত কর্মদিবস ও কর্মঘন্টা।

বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার পথে বাধাসমুহ

গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। তবে বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষা অর্জনে কতকগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

- শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ;
- নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়;
- শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ে বৈষম্য;
- শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগ;
- কম পড়ে পাশ করার মানসিকতা;
- শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ কমে যাওয়া;
- শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অপরাজনীতির বিস্তার;
- ডিগ্রি ও সার্টিফিকেটমুখীন শিক্ষা;
- শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতির বিস্তার;
- অভিভাবকদের বৈষয়িক মানসিকতা;
- সামাজিক অবক্ষয়;
- শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং নির্ভরতা;
- কোচিং ব্যবসা;
- ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতি;
- শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি;
- শিক্ষকদের দুর্বল একাডেমিক ভিত্তি;

- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে গাফিলতি;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী ভারসাম্যহীন অনুপাত;
- স্বল্প বিদ্যালয় সময়কাল বা সংযোগ ঘণ্টা;
- শিক্ষকদের যথাযথ মৌলিক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের অভাব;
- শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দুর্বলতা;
- শিক্ষকদের অনাকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার অর্জনের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের অবস্থান:

লিঙ্গভিত্তিক সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল (২০০০-২০১৫)

বৎসর	পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		উত্তীর্ণের সংখ্যা		পাশের হার	
	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে	মোট	মেয়ে
২০০০	৯১৮০৪৫	৪০২৮৭৩	৩৮১৭৬২	১৬১৭৪৫	৪১.৫৮	৪০.১৫
২০০১	৭৮৬২২০	৩৩৪২৫৫	২৭৬৯০৩	১১২৮৬৮	৩৫.২২	৩৩.৭৭
২০০২	১০০৫৯৩৭	৪৪১০২৪	৪০৮৯৬৯	১৬৬৩৩৯	৪০.৬৬	৩৭.৭২
২০০৪	৭৫৬৩৮৭	৩৪১৫৯৪	৩৬৩২৭০	১৫৭০৫৮	৪৮.০৩	৪৫.৯৮
২০০৫	৭৫১৪২১	৩৪৭৮১৫	৩৯৪৯৯৩	১৭৩৪৬৮	৫২.৫৭	৪৯.৮৭
২০০৬	৭৮৪৮১৫	৩৬৭৯৭০	৪৬৬৭৩২	২১০৯০৯	৫৯.৪৭	৫৭.৩২
২০০৭	৭৯২১৬৫	৩৭৮৯৮১	৪৫৪৪৫৫	২০৭৪৭১	৫৭.৩৭	৫৪.৭৪
২০০৮	৭৪৩৬০৯	৩৬১৫৪৫	৫২৬৫৭৬	২৪৯১০৪	৭০.৮১	৬৮.৯০
২০০৯	৭৯৭৮৯১	৩৯৩৫৯৯	৫৩৭৮৭৮	২৫৬১০৪	৬৭.৪১	৬৫.০৭
২০১০	৯১২৫৭৭	৪৫৩৭৭৯	৭১৩৫৬০	৩৪৬৪৯৪	৭৮.১৯	৭৬.৩৬
২০১১	১৩,৭,১৫৫		১০৭৫৮৮৬	৫১০১৫২	৮২.৩১	৮০.৭৬
২০১২	১৪,১২,৩৭৯	৬,৮০,২১০	১২১৯৮৯৪		৮৬.৩৭	৮৫.২৭
২০১৩	১২,৯৭,০৩৪	৬৬৫৮৭৮	১১৫৪৭৭৮	৫৬০৯৪০	৮৯.০৩	৮৮.৮৮
২০১৪	১০,৮৭৮৭০	৫,৫১,৯৭২	১০,০৮,১৭৪	৫,০৮,৪৯৭	৯২.৬৭	৯২.১২
২০১৫	১৪,৭৩,৫৯৪	৬,৯৯,৫২৫	১২,৮২,৬১৮			৮৭.০৪

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার হার ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের কারণে এ ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে বলে শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ মনে করেন। তবে শিক্ষার এ পরিমাণগত অর্জন গুণগত শিক্ষা অর্জনের পথে যথার্থ সহায়ক কিনা তা নিয়ে বির্তক আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য?
   ক. মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ
   খ. ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ ও মানসম্মত বিজ্ঞানাগার
   গ. মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক ও মানসম্মত বিজ্ঞানাগার
   ঘ. মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক, মানসম্মত বিজ্ঞানাগার, ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ ও যথার্থ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি

২. নিচের কোনটি গুণগত শিক্ষা অর্জনের পথে বাধা?
   ক. কার্যকর ব্যবস্থাপনা ওতত্ত্বাবধান
   খ. উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি
   গ. গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ
   ঘ. কোচিং ব্যবসা

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ক

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আপনার বিদ্যালয়ের গুণগত শিক্ষা অর্জনের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করুন। উক্ত বাধাগুলো দুর করণে আপনার পরামর্শ প্রদান করুন।

পাঠ- ৮.২: প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যযাচাই এবং সোয়াট বিশ্লেষণ: মূল্যযাচাই এবং এ্যাক্রেডিটেশন

Institutional Assessment and SWOT Analysis: Assessment and Accreditation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যযাচাই এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যযাচাই এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সোয়াটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সোয়াটের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এ্যাক্রেডিটেশন ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নের ধারণা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক মানযাচাই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু বিষয় জড়িত। জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্যের আলোকে নির্ধারিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা অর্জন, শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ও মান নিয়ন্ত্রণ, মানযাচাইয়ের জন্য প্রণীত পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নসমুহের কার্যকরিতা যাচাই, শিখন শেখানো কলাকৌশলের কার্যকারিতা যাচাই, দুর্বল শিক্ষার্থীর দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান ও দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বোপরী সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের সঙ্গে তুলনা করার পদ্ধতিমাফিক পর্যালোচনা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত। Institutional Assessment is the systematic collection, review, and use of information about educational quality, undertaken for the purpose of improving programs, services, student learning and development. Assessment of student learning demonstrates that the institution's students have knowledge, skills, and competencies consistent with institutional goals and that student at graduation have achieved appropriate higher education goals.

সোয়াট (SWOT)-এর ধারণা

ইংরেজি চারটি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে SWOT প্রত্যয়টি গঠিত। এর উপাদানগুলো হলো- S stands for Strengths (শক্তি), W= Weakness (দুর্বলতা), O= Opportunities (সুযোগ-সুবিধা) ও T= Threats (ঝুঁকি) যা সংক্ষিপ্ত করলে দাঁড়ায় SWOT। এটি ব্যবস্থাপনার কৌশলগত একটি পদ্ধতি।

কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ও যথাযথ সমাধান খুঁজে পাওয়া একটি উপায় হলো (SWOT) বিশ্লেষণ। কোন অবস্থা, কোন পণ্য এমনকি কোন কৌশলের SWOT বিশ্লেষণ করে সঠিক সমাধান বের করা সম্ভব। ১৯৬০ সালে স্ট্যানফোর্ড গবেষণা ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরামর্শক Albert Humphrey তার গবেষণায় (SWOT) কৌশল ব্যবহার করেন। এখানে শক্তি আর দুর্বলতাকে আভ্যন্তরীণ কারণ, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজের উপর নির্ভর করে। সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য এটাই নিয়াামক। অন্যদিকে অপারচুনিটি এবং থ্রেট হচ্ছে বাহ্যিক শর্ত যার

ওপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল তৈরির সময় আভ্যন্তরীণ কারণ বা শক্তি বা দুর্বলতাকে ঘিরে কৌশল নিতে হয়। SWOT বিশ্লেষণ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ।

A SWOT analysis is a tool that can provide prompts to the governors, management teachers and staff involved in the analysis of what is effective and less effective in the schools systems and procedures, in preparation for a plan of some form (that could be an audit, assessments, quality checks etc.)

SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis) is a framework for identifying and analyzing the internal and external factors that can have an impact on the viability of a project, product, place or person.

Strengths (সবলতা) Factors that are likely to have a positive effect on (or be an enabler to) achieving the school's objectives.	**Weaknesses (দুর্বলতা)** Factors that are likely to have a negative effect on (or be a barrier to) achieving the school's objectives	**Strengths and Weaknesses** are considered *internal* factors---meaning you as the business owner can control them.
Opportunities (সুযোগ–সুবিধা) External Factors that are likely to have a positive effect on achieving or exceeding the school's objectives, or goals not previously considered.	**Threats (ঝুঁকি)** External Factors and conditions that are likely to have a negative effect on achieving the school's objectives, or making the objective redundant or un-achievable.	**Opportunities and Threats** are considered *external* factors---meaning you have little control over them.

শিক্ষাক্ষেত্রে সোয়াট (SWOT) প্রয়োগ

শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **SWOT** বিশ্লেষণের মাধ্যমেসে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার মান, ব্যবস্থাপনা কমিটির যোগ্যতা, শিক্ষকদের পারদর্শীতা, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা ইত্যাদির মান যাচাই করা যায় এবং দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায়গুলো খোঁজে বের করা সম্ভব হয়। A SWOT analysis for schools is a tool that can provide prompts to the governors, management teachers and staff involved in the analysis of what is effective and less effective in the schools systems and procedures.

নিম্নে SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাংলাদেশের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো

Strengths (সবলতা)	Weaknesses (দুর্বলতা)
▪ পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ▪ যোগ্য, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী ▪ কার্যকর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ▪ রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস	▪ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ▪ নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশরুম এবং পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থা অসন্তোষজনক ▪ নিরাপদ খেলার মাঠের অভাব ▪ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তথা

▪ নিরাপদ পানির সুব্যবস্থা ▪ সুষ্ঠু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ব্যবস্থাপনা ▪ মনোরম পরিবেশ ও ভেত অবকাঠামো ▪ পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ▪ নিয়মানুবর্তিতা ▪ নকলমুক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র ▪ প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ শিক্ষকগণের জবাবদিহিতা ▪ অডিটে স্বচ্ছতা।	সীমানা প্রাচীর না থাকা ▪ বাহ্যিক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ▪ ছাত্র-ছাত্রীর মাসিক গড় অনুপস্থিতি ▪ শরীরচর্চা শিক্ষকের অভাব ▪ সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণের অব্যবস্থাপনা ▪ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা ▪ মেয়েদের জন্য আলাদা কমনরুম না থাকা ▪ শিক্ষকগণের কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত থাকা।
Opportunities (সুযোগ–সুবিধা) ▪ দীর্ঘমেয়াদী যুগোপযোগী ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ▪ সঠিকভাবে প্রয়োগ করে শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষমতা অধিকতর উন্নত করা সম্ভব। ▪ স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সম্পৃক্ততায় নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশরুম এবং পয়:নিষ্কাষণ ব্যবস্থা উন্নীতকরণ। ▪ নিজস্ব খেলার মাঠের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ▪ স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনের সহায়তায় নিরাপত্তা প্রাচীর স্থাপন ▪ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অভিভাবকদের বেশি বেশি সম্পৃক্তকরণ। ▪ ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ▪ স্থানীয়ভাবে বয়স্ক শিক্ষা, সান্ধ্যকালীণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালরা ▪ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।	**Threats (ঝুঁকি)** ▪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতা ▪ শিক্ষার অভাব ▪ বাল্য বিবাহ ▪ ইভ টিজিং ▪ রাজনৈতিক প্রভাব ▪ বখাটেদের উৎপাত ▪ প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে স্থানীয় প্রশাসন এবং শিক্ষকদের সাথে দূরত্ব থাকা ▪ প্রতিষ্ঠান প্রধান বা শিক্ষকদের নৈতিক স্খলন ▪ শিক্ষাকে লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সনাক্ত ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম।

মূল্যযাচাই ও এ্যাক্রিডিটেশন

Assessment of student learning demonstrates that the institution's students have knowledge, skills, and competencies consistent with institutional goals and that student at graduation have achieved appropriate higher education goals

Standards for Accreditation

- institutional mission, goals, and objectives;
- planning, resource allocation, and institutional renewal processes;
- institutional resources;
- leadership and governance;
- administration;
- institutional integrity; and
- student learning outcomes.

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন, নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা চালু, নমুনা নম্বর প্রদান, দক্ষতাভিত্তিক (MCQ) নির্দেশক ছক, কোশ্চেন সেটার, মডারেটর ও প্রধান পরীক্ষক এর প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মান উন্নয়ন, পরীক্ষা কেন্দ্রের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যযাচাই বলতে কী বুঝায়?
২. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যযাচাই এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৩. সোয়াট (SWOT)-এর ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে সোয়াট (SWOT)-এর প্রয়োগ বর্ণনা করুন।
৫. Accreditation-এর ধারণা বিবৃত করুন।

পাঠ- ৮.৩: গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, পরিমাপক ও নিশ্চিতকরণের উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

গুণগত শিক্ষা কোন একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে অর্জনের আশা করা যায় না। আধুনিক এবং যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম কিংবা মানসম্মত শিক্ষক সমাজের পক্ষে এককভাবে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো উপাদানের সমন্বিত এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ড। গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- বৈষম্যহীন সমন্বিত শিক্ষা;
- আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাক্রম;
- মানসম্মত ও পেশার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ শিক্ষক সমাজ;
- সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন;
- অভ্যন্তরীণ দক্ষতা;
- বাহ্যিক দক্ষতা।

বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপাদান

গুণগত শিক্ষার জন্য যে সকল উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে–

- স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি;
- মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ;
- যুক্তিসঙ্গত শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষকের যুক্তিসঙ্গত বেতন-ভাতা প্রদান করা;
- শিক্ষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- সময়োপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম চালু করা;
- মানসম্মত মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- যথাযথ মনিটরিং ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা পরিচালনা করা;
- কার্যকর নেতৃত্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- অভিভাবক শিক্ষক সম্পর্ক নিবিড়তর করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) থাকা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Equipments) থাকা;
- গঠনকালীন ও চূড়ান্ত (Formative and Summative) উভয় ধরনের মূল্যযাচাই-এ যথোপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা;
- পাবলিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মানের বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নয়?
   ক. নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি
   খ. সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন
   গ. অভ্যন্তরীণ দক্ষতা
   ঘ. বাহ্যিক দক্ষতা

২. নিচের কোনটি বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষা অর্জনের পথে বড় বাধা?
   ক. শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতেস্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার অভাব
   খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উচ্চ অনুপাত
   গ. শিক্ষকের অনুন্নত বেতন-ভাতা
   ঘ. শিক্ষকের জবাবদিহিতার অভাব

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক,

খ রচনামূলক প্রশ্ন

১. আপনার বিদ্যালয়ের গুণগত শিক্ষা অর্জনের জন্য করণীয়গুলো চিহ্নিত করুন।

পাঠ-৮.৪ শিক্ষায় সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনা (টিকিউএম): উদারিকরণ প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- টিকিউএম এর ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- টিকিউএম এর উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে হবে।

টিকিউএম বা সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনার ধারণা

ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অন্যের দ্বারা কার্য সম্পাদনের কৌশল বিশেষ। প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জনের জন্য মানব সম্পদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার করে এবং অধীনস্তগণ দায়িত্ব পালনে যে সমস্ত বস্তগত সম্পদ, ভৌত সম্পদ, অর্থ সম্পদ, তথ্য সম্পদ ব্যবহার করে তার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতের জন্য ব্যবস্হাপককে প্রধানতঃ পরিকল্পন, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান এবং নিয়ন্ত্রণ এই চারটি মৌলিক কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোকে এক কথায় ব্যবস্থাপনা বলে। অন্যদিকে টিকিউএম হচ্ছে স্বল্প সময়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেবার মান বৃদ্ধি করার একটি প্রক্রিয়া। Total Quality Management (TQM) is a comprehensive and structured approach to organizational management that seeks to improve the quality of products and services through ongoing refinements in response to continuous feedback. 'টিকিউএম মূলত একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সঠিক ব্যবস্থাপনায়, স্বল্প সময়ে সেবার মান বাড়িয়ে কাজ করার একটি ধারাবাহিকতা।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে আজকের জাপানের উন্নতির অন্যতম প্রধান মূলমন্ত্র হলো টিকিউএম। অথচ বাংলাদেশে এ জাতীয় ব্যবস্থাপনা সঙ্গে পরিচিতি বেশি নয়। টিকিউএম হচ্ছে স্বল্প সময়ে নির্দিস্ট পদ্ধতিতে সেবার মান বৃদ্ধি করার একটি প্রক্রিয়া। টিকিউএম পদ্ধতির মাধ্যমে একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে কাঙ্খিত ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে টিকিউএম বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা একান্ত দরকার। টিকিউএম এর বৈশিষ্ট্য-

- টিকিউএম হচ্ছে কোন সংগঠনের সকল দিকের দক্ষতা বৃদ্ধি।
  (TQM means quality in all aspects of organization).
- কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বলতে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকে বুঝায় না সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জীবন দক্ষতা অর্জনকে বুঝায়।
  The quality needs to be redefined from the narrow criteria of achievement of students in examinations to a holistic approach to quality of life in schools.
- দক্ষতা কোন ঘটনাক্রমিক বা দূর্ঘটনা থেকে প্রাপ্ত কিছু নয়।
  Quality is not incidental or accidental.
- টিকিউএম একটি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া।
  It is a planned and deliberate process.

- টিকিউএম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
  It should be on a continual basis.
- টিকিউএম এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের সন্তুষ্টি।
  The ultimate goal of TQM is customer satisfaction.

তাই বলা যায় TQM is the integration of all functions and processes within an organization in order to achieve continuous improvement of the quality of goods and services. The goal is customer satisfaction.

টিকিউএম এর উপাদান

টিকিউএম বাস্তবায়নের জন্য এবং টিকিউএম এর মাধ্যমে সফল হবার জন্যে যে কোন সংগঠনকে নিম্নোক্ত আটটি উপাদানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

- নৈতিকতা (Ethics);
- সততা (Integrity);
- বিশ্বাস (Trust);
- প্রশিক্ষণ (Training);
- যোগাযোগ (Teamwork);
- নেতৃত্ব (Leadership);
- স্বীকৃতি (Recognition);
- যোগাযোগ (Communication)।

প্রাইভেটাইজেশন এর ধারণা

উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবাধ-ব্যবসায় নীতির স্বপক্ষে জোর দাবির দানা বাধতে শুরু করে এবং এরই প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সে 'Laissey fair' বা ইচ্ছেমতো চলতে দেওয়ার নীতি নামে এক মতবাদ গড়ে ওঠে। এটিকেই বেসরকারিকরণ বলে। বেসরকারি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয় (Privatization is the process of transferring an enterprise or industry from the public sector to the private sector.)। অর্থনীতির জনক এডাম স্মীথ, জন স্টুয়ার্ট প্রমুখ এই মতবাদের জনক। এর মূল কথা হলো, শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে সরকারের কোন হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় এবং এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, কেননা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তির ভূমিকা মুখ্য। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছু কিছু ব্যবসায় আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করা হয়; যেমন– ব্যাংক, বীমা, পাটশিল্প, সেবা পরিবেশক শিল্প (গ্যাস, ওয়াসা, বিদ্যুৎ) ইত্যাদি। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে এমন জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বিধায় এগুলোর অনেক ক'টি আজ জাতির বোঁঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে পুনরায় বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তা অব্যাহত আছে।

প্রাইভেটাইজেশন এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১. দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (Improved Efficiency);

২. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত (Free From Political Interference);
৩. স্বল্পকালিন মূল্যায়ন (Short Term View);
৪. অংশীদারদের স্বক্রিয় অংশগ্রহণ (Shareholders Involvement);
৫. প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব (Increased Competition);
৬. বিক্রি থেকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি (Government will Raise Revenue from the Sale)।

অসুবিধা

১. স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসায় (Natural Monopoly);
২. জনস্বার্থ বিঘ্নতা (Public Interest Hampered);
৩. সরকারের সম্ভাবনাময় লভ্যাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় (Government Loses out on Potential Dividends);
৪. ব্যক্তিগত একচেটিয়া মনোভাব মোকাবেলা সমস্যা (Problem of Regulating Private Monopolies);
৪. শিল্পের খন্ড-বিখন্ডতা (Fragmentation of Industries);
৫. শিল্পের ক্ষণস্থায়ী অবস্থান (Short-Termination of Firms)।

গ্লোবালাইজেশন এর ধারণা

বিশ্বায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংস্থা বা এজেন্সিগুলো পারস্পরিক সক্রিয় অংশগ্রণের মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে নিজেদের মধ্যে নানা প্রকার সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিশ্বায়নের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের নানাবিধ বিষয় যেমন- অর্থনীতি, বাণিজ্য, যোগাযোগ, রপ্তানি, শিল্পায়ন ইত্যাদি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বায়ন সারা বিশ্বজুড়ে একই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক নকশা তৈরি করে দিচ্ছে, দুর্বল করে দিচ্ছে জাতি রাষ্ট্রকে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিগ্রহ করছে পশ্চিমা রূপ। তবে বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়ন ধারণা দুটি ভিন্ন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকগ্র'র মতে, "বিশ্বায়নকে বলা যায় আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং সম্পর্কেও নির্মিতকে"।

বিশ্বায়ন প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের বৈশ্বিকভিত্তিতে অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সাথে একীভূত করার প্রক্রিয়া। বহুমূখী এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক ও কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রসমুহ। জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে একীভূতকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখা করার জন্য এ শব্দটি অধিকতর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাণিজ্য, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, মূলধনের প্রবাহ, বর্হিবিশ্বে বসবাস ও কারিগরি প্রযুক্তিই হলো এ প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি।

বিশ্বায়নের বহুমূখী ধারাসমূহের কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভাজন করা সম্ভব। যথা: (১) শিল্প সংক্রান্ত (২) আর্থিক, (৩) অর্থনৈতিক, (৪) রাজনৈতিক, (৫) তথ্যপ্রবাহ, (৬) ভাষা, (৭) প্রতিযোগিতা, (৮) পরিবেশ, (৯) কৃষ্টি, (১০) সামাজিক, (১১) কারিগরি এবং (১২) আইনগত বা নৈতিক।

বিশ্বায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো–

১. মুক্ত বাণিজ্য নীতি;
২. বাজার ব্যবস্থার প্রাধান্য;
৩. বিশ্ব অর্থনীতির একত্রীকরণ;
৪. উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;
৫. বেসরকারিকরণ;
৬. মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা;

৭. রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ;
৮. অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ইত্যাদি।

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বায়নের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়:

- বিশ্বায়নের ফলে ভৌগোলিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে সামাজিক নতুন বিন্যাস যার মাধ্যমে দূরের মানুষের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। এই সামাজিক সম্পকের মধ্যে ক্ষমতার নতুন বিন্যাসও তৈরি হচ্ছে।
- বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের এবং বিনিময়ের ব্যাপ্তি, গভীরতা, গতি এবং প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বিশ্বায়নের ফলে নতুন নতুন নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী একে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বলে অভিহত করছেন।
- বিশ্বায়নের সাথে রাজনীতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিবিড়ভাবে জড়িত থাকলেও মুলত এটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া।
- বিশ্বায়ন কোন সংকীর্ণ ধারণা নয়, এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এর বহিঃপ্রকাশও বিভিন্নমুখী।

বিশ্বায়নের সুফল

১. স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় যেখানে সম্পদের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি তাদেরকে বাধ্য হয়েই বিশ্বায়নে অঙ্গীভূত হতে হচ্ছে।
২. অ-অপসারণীয় অধিকার (Inalienable) সংক্রান্ত ধারণার সংরক্ষণসহ এর অধিকতর সুসংহতকরণ এবং পুরুষ, নারী ও শিশু সংক্রান্ত সার্বজনীন নৈতিকতাবোধ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বিশ্বায়নের ভূমিকা ইতিবাচক।
৩. আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠাসহ আর্ন্তজাতিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আন্দোলন, জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশনভিত্তিক নীতি যথা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র বিশ্বায়নের ফসল।
৪. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বায়নের কুফল

১. এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হয় নি।
২. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিশ্বায়নের প্রভাব খুব একটা বেশি নয়।
৩. বৈশ্বিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে নি।
৪. বিশ্বায়ন কোন অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়।
৫. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে তৃতীয় বিশ্বের প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, অথচ হারাবার আশংকা অনেক।
৬. অনুন্নত দেশের কলকারখানাগুলো অবাধ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারায় তা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
৭. বিশ্বায়নের প্রভাবে অনুন্নত দেশের শিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য। কেননা বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্য টিকে থাকতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন দেশের উন্নয়নের মূলে ছিল টিকিউএম?
   ক. যুক্তরাষ্ট্র
   খ. জাপান
   গ. দক্ষিণ কোরিয়া
   ঘ. চীন

২. নিচের কোনটি বিশ্বায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়?
   ক. মুক্ত বাণিজ্য নীতি
   খ. বেসরকারিকরণ
   গ. সরকারি নিয়ন্ত্রণ
   ঘ. একচেটিয়া ব্যবসায়

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আপনার বিদ্যালয়ের গুণগত শিক্ষা অর্জনের জন্য করণীয়গুলো চিহ্নিত করুন।

পাঠ- ৮.৫: শিক্ষার প্রভাব ও প্রতিফলন: জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি
Impact and Educational Implication: Knowledge Economy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির প্রভাব ও প্রতিফলন চিহ্নিত করতে পারবেন।

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ধারণা

বিশ্বায়ন মানে জ্ঞান ও অর্জিত সম্পদের মুক্ত ও কল্যাণকর ব্যবহার। বিশ্বায়নকে ধাবিত হতে হবে মানবতার কল্যাণের জন্য। সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক বিকাশ ও প্রত্যাশিত উন্নয়নের প্রধান চলক জ্ঞান এবং শিক্ষা। একটি সমাজের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে জ্ঞান, দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তথ্যনির্ভর করে তোলার অর্থই হলো জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় কেবলমাত্র পুঁজিকেন্দ্রিক উপায়ে যেনতেন প্রকারে মুনাফা তৈরির এক বিশ্বায়ন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যহত আছে যা মানুষকে তার নিজের জায়গায় স্থির থাকতে বাধাগ্রস্থ করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তিকে সাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এটিই জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজের মূল কথা। A new society formed as a result of the contemporary societal change pushed by technological innovation and institutional transformation, which is not only about technological innovations, but also about human beings, their personal growth and their individual creativity, experience and participation in the generation of knowledge. The primary role of cities in a knowledge society is to ensure that their knowledge sources are passed on and advanced by each generation. অর্থাৎ আইসিটি উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার মাধ্যমে নতুনতর এক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অন্য নাম জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বা Knowledge Economy.

জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপাদান

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিক্ষা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি; মূলত এই বিষয়গুলো একটি দেশকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যায়। এগুলোর ওপর ভর করেই বিশ্ব মানচিত্রে একটি দেশ নিজের স্থানকে সুদৃঢ় করে। গ্লোবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। কম্পিউটারই দিতে পারে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মের সংস্থান। এটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ A society where main of the prosperity and well-being of its people came from the creation, sharing and use of knowledge is Knowledge-based Society. জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে সনাক্ত করা যায়-

১. জ্ঞানের অবাধ ও কল্যাণকর প্রবাহ;
২. পণ্যের অবাধ ও কল্যাণকর প্রবাহ;
৩. পুঁজির অবাধ ও কল্যাণকর প্রবাহ;
৪. শ্রমের অবাধ ও কল্যাণকর প্রবাহ;
৫. তথ্যের অবাধ ও কল্যাণকর প্রবাহ;
৬. বাণিজ্যের উদারীকরণ;
৭. বাজার উন্মুক্তকরণ।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি'র প্রভাব ও প্রতিফলন

টেকসই উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন। কেননা এক সময় ক্ষমতার উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদকে বিবেচনা করা হলেও বর্তমানে জ্ঞানকে বিবেচনা করা হচ্ছে। A knowledge society generates shares and makes available to all members of the society knowledge that may be used to improve the human condition. শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে সৃষ্টিশীলতা দিয়ে জ্যেষ্ঠতা দিয়ে নয়। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির মডেলের অংশ হিসেবে কৃষি ও কম মূল্যের শিল্পকেন্দ্রিক ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশকে সরিয়ে জ্ঞাননির্ভর এক উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যেতে হবে যেখানে নতুন ধারণা, গবেষণা ও সৃজনশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এ দেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার পথে শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয়, স্যানিটেশন, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রত্যাশিত মানের চেয়ে এখনো পিছিয়ে। কেননা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৮টি দেশের মধ্যে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ২৭তম, শিক্ষায় ২৫তম, উদ্ভাবনে ২৭তম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২৬তম। কেননা ২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের এই অবস্থান এখনো কাম্য নয়। তাই সামনে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন গ্রামগুলোর অর্থনীতি, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদির উন্নতিসাধনে মনোযোগ দেওয়া। সাথে সাথে জ্ঞানভিত্তিক প্রয়োজন সামাজিক শৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে দেশের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। আর এই গাঁথুনিগুলোতেও বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে শুধু কম্বোডিয়া ও মিয়ানমার। শিক্ষায় পাকিস্তান নেপাল ও কম্বোডিয়ার চেয়ে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। উদ্ভাবনে মিয়ানমার ছাড়া সব দেশের চেয়েই বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ২৭তম। এর নিচে রয়েছে শুধু মিয়ানমার। তবে ইতিবাচক দিক হলো অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা ভালো, ২৪তম। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিকাশের সাথে সাথে আমেরিকা, ইউরোপ অথবা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ ডাটা প্রসেসিংয়ের। যার ফলে আইসিটি সার্ভিসকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মত দেশসমূহের জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে। শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়, এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত বেকার দক্ষ জনগোষ্ঠীর। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকগণের প্রত্যাশা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০২১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করা হবে। ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে মধ্য আয়ের দিকে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন দরকার ভালো একটা উত্তরণ। তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষায় ভালো করতে পারলে এ উত্তরণ অনেকটাই সহজতর হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী অর্থনীতি, প্রতি বছর ৬ শতাংশ করে বেড়ে চলেছে, সেখানে সবার আগে উচ্চারিত হয় চিরচেনা পোশাক খাতের নাম। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটছে ধারণার। ধীরে ধীরে দেশটির ভবিষ্যত উন্নয়নে শ্রমভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর স্থলে ঠাঁই করে নিতে যাচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিশ্বায়ন মানে জ্ঞান ও অর্জিত সম্পদের মুক্ত ও কল্যাণকর ব্যবহার?
ক. জ্ঞানের কল্যাণকর ব্যবহার
খ. অর্জিত সম্পদের মুক্ত ব্যবহার
গ. অর্জিত সম্পদের কল্যাণকর ব্যবহার
ঘ. জ্ঞান ও অর্জিত সম্পদের মুক্ত ও কল্যাণকর ব্যবহার

২. নিচের কোনটি বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি অর্জনের পথে পিছিয়ে আছে?
ক. নারীর ক্ষমতায়ন
খ. শিক্ষা
গ. স্যানিটেশন
ঘ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ঘ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে উন্নত জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয়গুলো চিহ্নিত করুন।

পাঠ- ৮.৬: শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: পদ্ধতি, সুবিধা ও অসুবিধা

ICT in Educational Administration and Management: Methods, Advantages and Problems Involved

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি চিহ্নিত ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বলতে সাধারণতঃ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন ও বিস্তরণ তথা যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ বোঝায়। তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিস্কৃত হচ্ছে, তবে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয় সিস্টেম, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন উল্লেখযোগ্য। তথ্য প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যপক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বত্র তথা- ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়নমূলক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডসহ সকল কর্মক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মোট কথা বাংলাদেশকে একটি তথ্য-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায় এ দেশের সরকার ও জনগন। এলক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরগুলো।পাশাপাশি এদেশের জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তথ্য ও প্রযুক্তি নামের একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও তথ্য প্রযুক্তিতে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষতে পারে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারিভাবে কারিগরি শিক্ষাবোডের অনুমোদনে ও পরিচালনায় গড়ে উঠেছে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেসিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। এছাড়াও অনলাইনে এসব শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তো রয়েছেই। ফলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একদিন প্রযুক্তিবিদের ছড়াছড়ি হবে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহারে পাদরর্শি না হলেও নুন্যতম ব্যবহার না জানলে দেশের তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে কি করে? আর এ পথে কিছুটা অন্তরায় হলেও সেটা হলো ভাষা।

তথ্য প্রযুক্তির এ অকল্পনীয় ও সীমাহীন বিস্তৃতির যুগে এখন সবচাইতে আলোচিত প্রযুক্তি হচ্ছে কম্পিউটার। একুশ শতকের তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব মানব সভ্যতার গতি প্রকৃতি বদলে দিচ্ছে। তাই দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনমান। প্রযুক্তিগত দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সমতালে চলতে গেলে দেশের সকল কর্মক্ষেত্রে কম্পিউটারায়ন অত্যন্ত জরুরী। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারায়ন করা সম্ভব হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও দ্রুত গতি লাভ সম্ভব হবে। কম্পিউটার শিক্ষা এবং কম্পিউটার নির্ভর শিক্ষা এ দুটি বিষয় এখন পৃথিবীর সব দেশেই গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ অন লাইন এবং সিডি-শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে এ দুটি বিষয় বই, খাতা, শিক্ষক এবং লাইব্রেরীর বিকল্পে পরিণত হয়েছে। মোট কথা সব কিছুই ক্রমশ: কম্পিউটার নির্ভর হয়ে উঠেছে। সেহেতু শিক্ষাকেও কম্পিউটার নির্ভর করে তোলা জরুরি।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার এর উদ্দেশ্য

- স্কুল-কলেজে ভর্তিসহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রযুক্তির সহায়তায় সংরক্ষণ (তথ্য সংরক্ষণ);
- কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে অধিবেশনকে প্রানবন্ততকরণ;
- আধুনিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার সংগে সংগতি বিধান;
- স্কুল-কলেজে ভর্তিসহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রযুক্তি ব্যবহার;
- প্রতিষ্ঠানে সার্বিক ব্যবস্থাপনা কম্পিউটারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে কর্মমূখী শিক্ষায় শিক্ষিতকরণ;
- জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সংগে শিক্ষার্থীর পরিচিতিকরণ;
- বেকার সমস্যা সমাধান;
- অতি অল্প সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ এবং বাজেট প্রণয়ন।

কম্পিউটার পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

বর্তমান যুগে কম্পিউটারের মাধ্যমে অন-লাইন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ই-লার্নিং এর বিষয়টি সকলের কাছেই পরিচিত। আর কম্পিউটার পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা মানে হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখাপড়া করা; ছাত্রছাত্রীদের কাছে কম্পিউটারের সুযোগ পৌঁছানো। ছাত্র ভর্তি থেকে আরম্ভ করে প্রোগ্রাম রিপোর্ট তৈরি, রুটিন তৈরি, পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাসের নির্দেশনা ও পাঠ প্রদান, পাঠাগারের বই লেন-দেন, বাৎসরিক আয়-ব্যয়, ইনভেন্টরি ইত্যাদি কম্পিউটারের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজে করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপানসহ শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশেও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পুরোটায় আইসিটি নির্ভর। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট গড়ে তোলা এবং পরীক্ষা গ্রহণ, মেধা যাচাই, কর্মী নির্বাচনের কাজেও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আইসিটি'র ব্যবহার

কম্পিউটারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের জটিল থেকে জটিলতর গাণিতিক তথ্যগুলোকে পরিচালনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং এ তথ্যগুলি নিখুঁতভাবে চার্টের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়। হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে সাধারণত নিচের কাজগুলো করা যায়:

- ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ফি এর হিসাব সংরক্ষণ;
- দৈনন্দিন হিসাব সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ;

- বাজেট প্রণয়ন;
- বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশন;
- বেতনের হিসাব তৈরি;
- বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি;
- আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা;
- সকল তথ্যকে চার্ট বা গ্রাফের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন ইত্যাদি।

তথ্য ও প্রযুক্তির অপব্যবহার ও অসুবিধা

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিসীম। তবে তথ্য ও প্রযুক্তি আধুনিক জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে কিন্তু এর কিছু অপব্যবহার হয়ে থাকে যার নেতিবাচক প্রভাব ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনে এসে পড়ছে। সাইবার অপরাধীরা হ্যাকিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গোপন তথ্য ফাঁস করে নিচ্ছে এমনকি সমাজের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও মহিলাদের একাউন্টে প্রবেশ করে তাদের ছবি, ব্যক্তিগত ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে এবং এসব তথ্য দিয়ে তারা আইন বিরোধী কাজ করছে। হ্যাকিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কেউ কোনো বৈধ অনুমতি ছাড়া কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে বিভিন্ন আন বর্হিভূত কাজ করে।

পাঠ- ৮.৭ ই-গর্ভমেন্ট: ধারণা, বৈশিষ্ট্য, অনুশীলন ও সমস্যা, শিক্ষায় ই-গর্ভমেন্ট
E-government: Concept, Features, Practices and Problems Involved, E-government in the Context of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ই-গর্ভমেন্ট এর ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ই-গর্ভমেন্ট এর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-গর্ভমেন্ট বাস্তবায়নের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করতে পাবেন।
- শিক্ষায় ই-গর্ভমেন্ট এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ই-গভর্মেন্ট এর ধারণা

বর্তমানে Information Technology (IT) বা তথ্য প্রযুক্তি অথবা Information Communication Technology (ICT) বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের কাছে খুব বেশি পরিচিত। কেননা, প্রতিদিনের জীবনে আইটি অথবা আইসিটি যে কোন ভাবেই হোক না কেন, প্রভাব বিস্তার করে। E-government is the use of information and communication technologies (ICTs) to improve the activities of public sector organisations. Some definitions restrict e-government to Internet-enabled applications only, or only to interactions between government and outside groups. মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে। কেননা, তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক সময়ে তথ্য প্রযুক্তি ছিল না, তখন ছিল যোগাযোগ প্রযুক্তি। অর্থাৎ রেডিও টরে-টক্কা টেলিগ্রামই ছিল তখনকার সময়ে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রযুক্তি। পরবর্তীতে টেলিভিশন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রচলন হলে যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির বিবর্তন যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। এক সময়ে অফিস-আদালতে শুধুমাত্র ইন্টারনেট প্রচলনের মাধ্যমে তথ্যের বা ডেটার আদান প্রদান করতো। কিন্তু পরর্তীতে ওয়েবপেজ (Webpage) উদ্ভাবনের ফলে পৃথিবীর সকল ঘটনা বা তথ্য ঘরে বসেই এক নিমিষে পাওয়ার এক গৌরবময় বিবর্তনে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একীভূতকরণ করে মানুষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ই-গভর্মেন্টের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান করা সহজতর হয়েছে।

ই-গভর্মেন্ট সরকারি ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন ব্যবসায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

e-governance-এর প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের অনেক দেশই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি'র শক্তি কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আইসিটি'র গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে পৃথিবীতে আইসিটিবিহীন ভবিষ্যত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না। আধুনিক

বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে আইসিটি'র ক্ষেত্রে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম, কিন্তু মানব সম্পদ আইসিটি উন্নয়নে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের সুবিধা হলো- আমাদের দেশের মানব সম্পদের প্রাচুর্যতা। তাই আইসিটি'র উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা এদেশের পক্ষে সম্ভব। আইসিটি'র প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন মাত্রাতে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে '4C' (Computing, Connectivity, Content, Capacity)-এর তাৎপর্যের মাধ্যমে e-governance-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো:

Electronic governance or e-governance is the application of information and communication technology (ICT) for delivering government services, exchange of information, communication transactions, integration of various stand-alone systems and services between government-to-customer (G2C), government-to-business (G2B).

আইসিটি'র কেন্দ্র বিন্দুই হলো কম্পিউটার। টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) কিংবা দারিদ্র বিমোচন করতে প্রয়োজন সৃজনশীল উদ্ভাবনী ও ইনফরমেশন সিস্টেম বা ম্যানেজম্যান্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)যা কম্পিউটিং-এর মাধ্যমেই তৈরি করা হয়। কম্পিউটার সিস্টেম বলতে স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটেড পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। এই অটোমেটেড পদ্ধতির ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। আইসিটি'র কোন কাজের প্রক্রিয়াকরণে সময় কম লাগে অর্থাৎ দ্রুতগতিতে নির্ভুলভাবে কোন কাজ সম্পাদন করা যায়। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বদৌলতে মানুষ ঘরে বসেই সমস্ত পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। যে কোন স্থান হতেই মানুষ মোবাইল কিংবা ইন্টারনেট সংযোগের মাধমে প্রতিষ্ঠানের সাথে কিংবা প্রয়োজনীয় কোন ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত থাকতে পারছে। বিভিন্ন তথ্যের তাৎক্ষণিক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ সম্পাদন করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়নে আইসিটি অবিশ্বাস্য অথচ নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তুর বিস্তারের জন্য আইসিটি'র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সট, অডিও, অডিও-ভিডিও, গ্রাফিক্স, বিনোদন, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক খবরা-খবর, বিভিন্ন ব্যবসায়িক জার্নাল বা প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে আইসিটি'র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও সত্য কোন তথ্য সহজে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইসিটি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মানুষের সচেনতা সৃষ্টি, সক্ষমতা প্রকাশ, জ্ঞানার্জন এবং বিতরনের জন্য আইসিটি'র তাৎপর্য বা প্রয়োজনীয়তা সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে স্বীকৃত।

ই-গর্ভমেন্ট এর বৈশিষ্ট্য

1. E-Citizenship
2. E-Registration
3. E-Transportation
4. E-Health
5. E-Education
6. E-Help
7. E-Taxation
8. E-Democracy
9. E-Feedback
10. E-administration
11. E-police
12. E-courts
13. E-Taxation
14. E-Licensing
15. E-Tendering.

ফই-গভর্মেন্টের বিদ্যমান অনুশীলন

১. ই-কমার্স (Electronic Commerce):

পণ্য বা সেবার উৎপাদন, সরবরাহ, সার্ভিসিং, মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি মার্কেটিং এর কার্যাবলি যখন ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত হয় তাকে সংক্ষেপে ই কমার্স অর্থাৎ ইলেকট্রনিক কমার্স বলে। একে ইংরেজিতে Electronic Commerce সংক্ষেপে e-commerce বলে। ইন্টারনেট মার্কেটিং, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, চেইন ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন ট্রানজেক্শন, অটোমেটেড ডেটা কালেকশন ইত্যাদি সিষ্টেমসমূহের ব্যাপক উদ্ভাবন ও প্রচলনের দরূন ই কমার্সেরও প্রসার ঘটেছে দ্রুতগতিতে। নিরাপদ লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেকেই ই-কমার্সের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠছে। সাধারণত ই-কমার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে গিয়ে বই থেকে শুরু করে মুদি দোকানের সুঁই থেকে রিয়েল এস্টেটের মতো দামী উপকরণও কিনতে পারেন। এর সুবিধা হলো, যে কোন পণ্য দ্রুত এবং সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করেও পণ্য বা সেবা ক্রেতার হাতে পৌঁছে যায়, গুণগত পণ্যের উন্নত সেবা প্রদান করার সুযোগ রয়েছে, বাহ্যিক সেটআপ ছাড়াই দৈহিকভাবে না গিয়েও ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় ইত্যাদি। ই-কমার্সের আবার কিছুটা অসুবিধাও রয়েছে, যেমন- লেনদেনের নিরাপত্তার অভাব, আইনগত বিষয়ে প্রয়োগ সমস্যা, দূরবর্তী স্থানে পণ্য পৌঁছানো এবং উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক ব্যয় ইত্যাদি।

ই-কমার্সের সেবাসমূহ: স্ট্রিমিং মিডিয়া, ইলেকট্রনিক ই-বুক, সফটওয়্যার, ব্যাংকিং, ফুড অর্ডারিং, অনলাইন ফ্লাওয়ার ডেলিভারি, ডিভিডি রেন্টাল, ট্রাভেল, ট্রেডিং কম্যুনিটি, নিলাম, অনলাইন ওয়ালেট, বিজ্ঞাপন, মূল্য যাচাইয়ের তুলনামূলক সেবা ইত্যাদি।

২. ই-বিজনেস (Electronic Business)

ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করাকে ই-বিজনেস বা ইলেকট্রনিক বিজনেস বলে। যে কোন ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবাসমূহ দলে, গোত্রে, স্বতন্ত্রভাবে এমনকি ব্যবসায়ের মধ্যেও পারস্পরিক বাণিজ্যিকিকরণে আদান প্রদান হয়। এই সকল পক্ষসমূহের সাথে ই-বিজনেস তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলে। অর্থাৎ কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে শিল্প, বিনিময় এবং বাণিজ্যিক যেসকল কাযার্দি সম্পন্ন হয় তাকে ই বিজনেস বলে। ই-বিজনেস- এ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির যাবতীয় ডেটা কাস্টমারদের কাছ হতে সংগ্রহ করা হয় এবং সেই মোতাবেক ভোক্তার রুচি ও চাহিদা পূরণ করে ভোক্তা সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। ই-বিজনেস-এর প্রক্রিয়ায় Supply Chain Management এর কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয়। যেমন– ইলেকট্রনিক উপায়ে ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান, অর্ডার গ্রহণ, অর্ডার চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে ও কম সময়ে করা যায়। ভোক্তা সেবা, ব্যবসায়িক পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা ইত্যাদি ইন্টারনেটে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়াও সরকারের রাজস্ব প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্যে খবরাখবর নেওয়া ইত্যাদি, বিভিন্ন স্থানে কাঁচামাল এবং পণ্যের মূল্য স্তরের খোঁজ খবর রাখাও ই-বিজনেস প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শিল্প কারখানায় পণ্য বা সেবাসমূহ কম্পিউটারাইড পদ্ধতিতে উৎপাদিত হচ্ছে। এতে স্বল্প সময়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম মানব সম্পদ ব্যবহার করে একদিকে যেমন অধিক পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হচ্ছে অন্যদিকে পণ্যের গুণগত মানও রক্ষা হচ্ছে। বর্তমানে ব্যবসায়ের বিভিন্ন গবেষণাও তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল।

৩. ই-মার্কেটিং (e-marketing)

ইংরেজিতে 'e-marketing'-কে ইন্টারনেট মার্কেটিং, অনলাইন বিপণন বা অনলাইন মার্কেটিং ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এর অর্থ হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিপণন করা। ইন্টারনেট মার্কেটিং ক্ষেত্রটি খুবই বিস্তৃত। তাই ইন্টারনেট ছাড়াও ই-মেইল, ওয়্যারলেস বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যেও এ ধরনের মার্কেটিং করা যায়।

মার্কেটিং ছাড়া কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্বে সবচেয়ে বেশী খরচ হয় মার্কেটিং এর পেছনে। তার প্রমান আমরা টেলিভিশন অন করলেই দেখতে পাই। দৈনিক শত শত ই-কর্মাস সাইট যেমন খোলা হয় তারচেয়ে বেশী সাইট বন্ধ হয়ে যাই শুধুমাত্র ভাল মার্কেটিং এর অভাবে। আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে মার্কেটিং নামক জটিল বিষয়টা অনেক সহজতর হয়েছে, কেননা অনেক কম খরচে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এর মার্কেটিং ইন্টারনেট এর মাধ্যমে করা যায়। মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণ হচ্ছে পণ্য-সেবা গ্রাহক পর্যন্ত পৌছানোর জন্য যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করা দরকার সেগুলো করা। যে সব কার্যাবলী মার্কেটিং করে থাকে তা'হলো:

১. উৎপাদন (Manufacturing);
২. ব্র্যান্ডিং (Branding);
৩. মোড়কীকরণ (Packaging);
৪. বিজ্ঞাপন (Advertisement);
৫. অর্থসংগ্রহ (Funding);
৬. বিক্রয় (Selling)।

শিক্ষায় ই-গর্ভমেন্ট

বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নাগরিকদেরকে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাক্রমে ICT অন্তর্ভূক্ত করেছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায় যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে ও আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির বহুবিধ উপায়ে প্রয়োগ করা যায়। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রস্তুত করার লক্ষ্য থেকে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় হিসেবে ICT অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশের জাতিয় শিক্ষাক্রম- ২০১২-এ মাধ্যমিক স্তরে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখি ব্যবহার, এর বিভিন্ন অংশের পরিচয়, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ধারণা ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ে সংযুক্ত করা হয়। আবার উচ্চ শিক্ষা স্তরে জ্ঞানের পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অধ্যয়নের সুযোগ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন দেশের উন্নয়নের মূলে ছিল টিকিউএম?
   ক. যুক্তরাষ্ট্র
   খ. জাপান
   গ. দক্ষিণ কোরিয়া
   ঘ. চীন

২. নিচের কোনটি বিশ্বায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়?
   ক. মুক্ত বাণিজ্য নীতি
   খ. বেসরকারিকরণ
   গ. সরকারি নিয়ন্ত্রণ
   ঘ. একচেটিয়া ব্যবসায়

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আপনার বিদ্যালয়ের গুণগত শিক্ষা অর্জনের জন্য করণীয়গুলো চিহ্নিত করুন।